ANTARVIDYA
ISSN: 3107-7447
https://www.debracollege.ac.in/antarvidya/Index.aspx

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427450 VOL-I, ISSUE-II (Jul-Dec 2025)

পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের আগমন ও পুনর্বাসনঃ একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ (১৯৪৭-১৯৭১)

ফারুক সেখ
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর
fsk811019@gmail.com

Submitted on: 09.11.2025
Accepted on: 25.12.2025

সংক্ষিপ্তসার- ১৯৪৭ সালের দেশভাগ উপমহাদেশের ইতিহাসে এক গভীর মানবিক বিপর্যয়ের সূচনা ঘটায়। দেশ বিভাজনের পর পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুদের ঘর ছেড়ে বাধ্যতামূলকভাবে চলে আসা সাম্প্রতিককালের মধ্যে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনাসমূহের মধ্যে এক অন্যতম নিদর্শন। জন্মভূমির সঙ্গে ভালোবাসার অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ একটি জীবন্ত, জাগ্রত মনুষ্যগোষ্ঠীকে পুরোপুরি উপড়ে ফেলে দেওয়ার এই কাহিনী। কিন্তু পাঞ্জাবে যা ঘটেছিল, পূর্ববাংলায় তা ঘটেনি। এক প্রচণ্ড বিধ্বংসী হত্যালীলা ও জনবিনিময়ের দ্বারা জন্মভূমি থেকে দুই বিপুল মনুষ্যগোষ্ঠীকে স্বল্পকালের মধ্যে উপড়ে ফেলার মতো কাজ সম্পন্ন হয়েছিল পাঞ্জাবে। কিন্তু বিভক্ত বাংলায় হিন্দু-মুসলমান– এই দুই মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে এই বিনিময় হয়নি। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে আসতে হয়েছিল মূলত হিন্দুদের। আবার মুসলমানদের মধ্যেও গুটিকয়েক জনকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে হয়েছিল। পাঞ্জাবের মতো কোনো মহাপ্রলয় হয়নি বাংলায়। পূর্ব-পাকিস্তানের সব হিন্দুদের একসঙ্গে একই সময়ে উপড়ে ভারতে ছুঁড়ে দেওয়া হয়নি। তাঁরা ধীরে ধীরে বিভিন্ন পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে। আমি এখানে দেখাতে চাইছি মূলত দেশভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুরা কেন পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিল। তাঁদের মধ্যে কোন শ্রেণির উদ্বাস্তুরা চলে এসেছিল। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন নীতি ও তার বাস্তবায়ন এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পর্যালোচনা করা, তাছাড়া উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কি ধরণের পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল; তাঁদের আগমনের মূল কারণ কি শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল না অন্য কোনো কারণের জন্য তারা নিজেদের জন্মভিটে ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গমুখী হতে বাধ্য হয়েছিল, এই বিষয়গুলিই মূল আলোচ্য হয়ে উঠেছে এই প্রবন্ধে।

সূচক শব্দ- দেশভাগ, উদ্বাস্তু, পূর্ব-পাকিস্তান, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অভিবাসন, পুনর্বাসন।

অভিবাসন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, যা বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভর করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, জনবিন্যাসের ধারা ইত্যাদি অভিবাসনের প্রবাহকে আরও তীব্র করে তোলে। এর পাশাপাশি আকস্মিক ঘটে যাওয়া পরিবেশগত বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগও এক স্থান থেকে অন্য

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427450

স্থানে মানুষের স্থানচ্যুতি তরান্বিত করেছে। উচ্চতর জীবনযাত্রা, আর্থিক নিরাপত্তা, ও শিক্ষাগত সুযোগে সন্ধানের উদ্দেশে মানুষ ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের দিকে স্থানান্তরিত হতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়ার ফলে গন্তব্য দেশগুলোর জন্য একটি নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়, কারণ এটি তাদের সীমিত ভূমি ও সম্পদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে স্থানীয় জনগণ ও নতুন অভিবাসীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, এবং এসব পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সরকারকে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়।[১] ভারত ছিল এশিয়ার এক অন্যতম দেশ, যা বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা থেকে আগত বিপুল পরিমাণ অভিবাসীকে আশ্রয় দিয়েছিল। এর ফলে ভারত বিশ্বের শীর্ষ দশটি অভিবাসন গন্তব্য দেশের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করেছে, যেখানে অধিকাংশ অভিবাসী প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে এসেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক দপ্তর-এর ২০২০ সালের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতে প্রায় ৪.৮ মিলিয়ন অভিবাসী বসবাস করেছিল।

ভারতে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসন একটি স্বাভাবিক ঘটনা এবং এর সূচনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। সে সময় ভারত অবিভক্ত ছিল এবং ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার জনসংখ্যা স্থানান্তরকে আন্তঃদেশীয় নয়, বরং অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি হিসেবেই বিবেচনা করা হত।[২] ১৯৪০ এর দশকে এই জনসংখ্যা স্থানান্তর চরম পর্যায়ে পৌঁছায়, যখন ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে এবং দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়। ভারত ভাগ ইতিহাসের এক গভীর ও বেদনাদায়ক ঘটনা। এটি কেবল ভৌগোলিক বিভাজনই ঘটায়নি, বরং ধর্মের ভিত্তিতে সমাজকেও বিভক্ত করে দেয়। আসাম, বাংলা ও পাঞ্জাব- এই তিনটি প্রধান প্রদেশে হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যার আধিক্য অনুসারে বিভক্ত হয়। এই বিভাজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম-প্রধান পাকিস্তান এবং হিন্দু-প্রধান ভারতের সৃষ্টি। ধর্মীয় ভিত্তিতে ব্রিটিশ বাংলাকে পূর্ব ও পশ্চিম -এই দুই অংশে প্রধানত বিভক্ত করা হয়, যা যথাক্রমে পূর্ববাংলা ও পশ্চিম বাংলা নামে পরিচিত হয়। পূর্ববাংলা পশ্চিম পাকিস্তান দ্বারা শাসিত হতো, যা ভৌগোলিকভাবে প্রায় এক হাজার মাইল দূরে অবস্থিত ছিল এবং পরবর্তীকালে যা স্বাধীন বাংলাদেশে পরিণত হয়।[৩] ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ব্রিটিশদের কাছ থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। তার পূর্বে, ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি ঘোষণা করেন যে, ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। এই পরিপেক্ষিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ এই দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল আলাদা সরকার গঠনের আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশন একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাব দেয়, যেখানে কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও অন্যান্য দলের প্রতিনিধিত্ব থাকার কথা ছিল। এই প্রস্তাব অনুযায়ী কংগ্রেস একটি অতিরিক্ত আসন লাভ করে, যার ফলে মুসলিম লিগ এর বিরোধিতা করে এবং ১৯৪৬ সালের ২৯ই জুলাই অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের কাউন্সিল সভা এই প্রস্তাব গ্রহণ করে। এর ফলেই ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' পালিত হয়।[৪]

যদিও মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, তবু কলকাতায় এই দিনটি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, যা ইতিহাসে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে অভিহিত। এই দাঙ্গায় প্রায় ৫,০০০ থেকে ১০,০০০ মানুষের মৃত্যু হয় এবং প্রায় ১৫,০০০ মানুষ গুরুতর আহত হন। এই ঘটনার জন্য উভয় রাজনৈতিক পক্ষ একে অপরকে দোষারোপ করে।[৫] এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক হারে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। নিরীহ মুসলমানদের মধ্যে ভুল প্রচার চালানো হয় যে, কলকাতার দাঙ্গায় হিন্দুরা ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলমানদের হত্যা করেছে। এর ফলস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সহিংসতা চালানো হয়। সংঘটিত হত্যা, লুটতরাজ, ধর্ষণ, অপহরণ, এবং হিন্দুদের সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ সাধারণ ঘটনা হয়ে ওঠে। এই ঘটনার ফলে গান্ধীজী ১৯৪৬ সালের ৬ই নভেম্বর নোয়াখালীতে যান শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাঁর উপস্থিতি

সত্ত্বেও হিংসা বন্ধ হয়নি।[৬] অবশেষে ১৯৪৭ সালের ২ই মার্চ তিনি তাঁর মিশন বন্ধ করে বিহারে চলে যান। পরবর্তীকালে নোয়াখালী থেকে প্রাপ্ত বার্তায় সংবাদ জানানো হয় যে, হিন্দুদের জীবন নিরাপদ নয়। এই প্রেক্ষাপটে তিনি মন্তব্য করেন যে, এই প্রতিকূল পরিস্থিতে হিন্দুদের ভারত চলে যেতে হবে, নয়তো তাদের জীবন ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতে হবে। জওহরলাল নেহরুও ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে যদি বাঙালি হিন্দুরা নিজেদের নিরাপত্তাহীন মনে করেন, তবে তারা ভারতে এসে আশ্রয় নিতে পারেন এবং ভারত সরকার তাদের জন্য নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবে। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা শুরু হয়েছিল, স্বাধীনতারও ঠিক এক বছর আগে ১৯৪৬ সালের নোয়াখালী ও ত্রিপুরা হত্যাকাণ্ডের পর থেকে, যা ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।[৭]

এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ হল ১৯৪৬ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী আগমনের সময়গত পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা এবং একই সঙ্গে শরণার্থী প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ পর্যালোচনা করা। এই সময়কালকে 'দেশভাগজনিত অভিবাসন' বলা হয়, কারণ ১৯৪৬-১৯৪৭ সালের মধ্যে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে এবং অবিভক্ত বাংলার বিভাজনের ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের সৃষ্টি হয়।[৮] এই অভিবাসীরা শরণার্থী নামে পরিচিত হয়, কারণ তারা পরিস্থিতির জন্য নিজের জন্মভিটে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং ভারত সরকার জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার (UNHCR) সংজ্ঞা অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের পরেও বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে জনসংখ্যার স্থানান্তর অব্যাহত ছিল, তবে এই পর্যায়ের অভিবাসনকে কোনো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার ফল হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি।[৯] ফলে ১৯৮১ সালের জনগণনা থেকে তাদের 'শরণার্থী' নয়, বরং 'ভারতের বাইরে জন্মগ্রহণকারী অভিবাসী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এই প্রবন্ধটি যেহেতু ১৯৪৬ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের উপর কেন্দ্রীভূত, তাই এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সময়ের সঙ্গে তাদের স্থানচ্যুতির ধরণ এবং বিভিন্ন পর্যায়ে শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা।[১০]

পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল এবং তাদের জনসংখ্যাও সমানভাবে বিভাজিত ছিল। তাদের অধিকাংশেরই বসবাস ছিল পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলে। ওই অঞ্চলগুলি ছিল হিন্দু প্রধানদের শক্ত ঘাঁটি। বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলের মধ্যে ছিল- খুলনা, উত্তর বরিশাল, দক্ষিণ ফরিদপুর ও ঢাকা। তাদের মধ্যে সামাজিক ভেদাভেদও ছিল।[১১] এদের মধ্যে অনেকে ছিল উচ্চশ্রেণির হিন্দু, ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ। তাদের বসবাস ছিল প্রধানত বরিশাল, ঢাকা, ও বিক্রমপুরে। এই উচ্চশ্রেণির ভদ্রলোকেরা নিশ্চিতভাবে শিক্ষিত এবং ঐতিহ্যগতভাবে বিভিন্ন অফিসের কাজে নিয়োজিত ছিল। এদের মধ্যে অনেকে ইংরেজি বা বাংলা ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু, সম্ভবত এই অঞ্চলের ১০ লাখ এবং সমগ্র পূর্ববঙ্গের ৪০ লাখের বেশি হিন্দু ছিল সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের অনেক নিম্নস্তরের, অনুন্নত বা তফসিলি সম্প্রদায়।[১২] নমঃশূদ্র, পোদ ও জেলে- কৈবর্তরা তাদের সাধারণ জীবিকানির্বাহ করত কৃষক, শ্রমিক ও জেলে হিসেবে। শরণার্থীরা সাধারণত ভারতের সীমান্তবর্তী স্থানের নিকটবর্তী এলাকাগুলিকে তাদের আশ্রয়ের জন্য প্রধানত বেছে নিতেন। পূর্ব-পাকিস্তানের চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলের (বর্তমান কুমিল্লা) অধিবাসীরা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে বসতি স্থাপন করেন।[১৩] ময়মনসিংহ ও রংপুরের বাসিন্দারা একসঙ্গে আসামের উত্তরের দিক, কোচবিহার, এবং জলপাইগুড়িকে নিজেদের বাসস্থান হিসেবে নির্বাচন করে। রাজশাহী এবং পূর্ব দিনাজপুর এর উদ্বাস্তুরা মালদা, ও পশ্চিম দিনাজপুর জেলাতে বসতি নির্মাণ করেন। পূর্ব-পাকিস্তানের মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে আগত শরণার্থীরা বানপুর ও বনগাঁ সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেন।[১৪]

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427450

উচ্চশ্রেণির একদল উদ্বাস্তু সরাসরি এইসময় ঢাকা থেকে কলকাতায় বিমানে করে আসতে থাকে। এই কারণে সরকার কলকাতা বিমানবন্দরে কিছু দিনের জন্য একটি অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেছিল উচ্চশ্রেণির উদ্বাস্তুদের জন্য। পূর্ব-পাকিস্তানের মাদারিহাট মহাকুমার অন্তর্গত ফরিদপুর জেলায় ট্রেন যোগাযোগ সহজলভ্য ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় এই সমস্যার সমাধান করেন।[১৫] তিনি ১৫ টি স্টিমারের বন্দোবস্ত করে উদ্বাস্তুদের উদ্ধার করেন। এই স্টিমারগুলিতে উদ্বাস্তুদের নিয়ে গিয়ে কলকাতা বন্দরে নামিয়ে দেওয়া হয়, এবং তাদেরকে ট্রেনের মাধ্যমে নিদিষ্ট পথে ট্রানজিট ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হতো। প্রত্যেকদিন কমপক্ষে ১৫০০০ উদ্বাস্তু জাহাজের মাধ্যমে কলকাতা বন্দরে এসে পৌঁছাতেন। সরকার তাদের পারিবারিক বিবরণ নথিভুক্ত, সীমান্ত স্লিপ প্রদান করত এবং পরে ক্যাম্পে পাঠাত। ভাগীরথী নদীর পূর্ব- পশ্চিম দিকে অবস্থিত বাবুঘাট, এবং শালিমার ঘাটও উদ্বাস্তুদের নামার জন্য ব্যবহার করা হত।[১৬] নতুন আগত শরণার্থীদের গ্রহণ ও অস্থায়ী আশ্রয়ের জন্য বিভিন্ন ট্রানজিট পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছিল- যেমন বানপুর, পেট্রোপল, হাসনাবাদ, শিয়ালদহ, বসিরহাট, বালুরঘাট, মালদা, কোচবিহার, রায়গঞ্জ, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, ক্যানিং, বহরমপুর, ইত্যাদি অঞ্চলে। সীমান্ত স্লিপ পাওয়ার পর শরণার্থীরা 'বৈধ শরণার্থী' হিসেবে স্বীকৃত হতেন, এবং সরকারি সহায়তা পেতে শুরু করতেন। শিয়ালদহ ছিল একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট পয়েন্ট, যেখানে ট্রেনে আগত শরণার্থীরা জমায়েত হতেন। তারা নতুন ক্যাম্পে স্থানান্তর হবার আগে পর্যন্ত সরকারি অনুদান পেতেন। অনেক ক্ষেত্রে স্টেশন চত্বরেই অস্থায়ী শিবির গড়ে ওঠে এবং শত শত মানুষ একসঙ্গে বসবাস করতেন।[১৭]

নোয়াখালী ও ত্রিপুরা দাঙ্গা এবং প্রথম পর্যায়ের অভিবাসন

শরণার্থী আগমন কখনই সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়নি; অল্প সময়ের বিরতি ছাড়া এটি বিভিন্ন পর্যায়ে অব্যাহত ছিল। চক্রবর্তী (১৯৯৯) শরণার্থীদের স্থানচ্যুতির বিভিন্ন ধাপ ব্যাখ্যা করেছেন, যার প্রথম পর্যায় শুরু হয় ১৯৪৬ এর নোয়াখালী ও ত্রিপুরা দাঙ্গার পর থেকেই।[১৮] এই পর্যায়ে পূর্ব-পাকিস্তানের একদল হিন্দু জনগণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য তাদের ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হন। মুসলমানদের দ্বারা মানসিক চাপ, আবেগপূর্ণ হয়রানি, ইত্যাদি বিষয়গুলিও ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদের দেশ ছাড়ার মুখ্য কারণ। পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের চলে আসা কিন্তু অল্পবিস্তর চলতেই থাকে। চাপা উত্তেজনা ছিলই, দেশভাগ ঘোষণার পর তা ক্রমশও প্রবল হয়ে ওঠে; অপর সম্পদায়ের দিক থেকেও হুমকি ছিল।[১৯] স্বাধীনতার মাসখানেক আগেই *'প্রবাসী'* পত্রিকায় লেখা হয়েছিলঃ 'পূর্ববঙ্গের বহু হিন্দু পরিবার সর্বস্ব বিক্রি করে চলে আসতে আরম্ভ করেছেন'। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির হিন্দুরা নিজেদের দেশ ছেড়ে একটি নতুন দেশে পাড়ি জমাতে শুরু করেছিল। তিন ধরণের উদ্বাস্তু ছিল- একশ্রেণির উদ্বাস্তু ছিল উচ্চশ্রেণির, দ্বিতীয় শ্রেণির উদ্বাস্তুরা ছিলেন মধ্যবিত্ত, আর শেষের উদ্বাস্তুরা ছিলেন মধ্য- নিম্নবিত্ত শ্রেণির। উচ্চশ্রেণির উদ্বাস্তুদের আগে থেকেই এপার বাংলার মানুষদের সঙ্গে কিছুটা হলেও সুসম্পর্ক ছিল, যার ফলে তাদেরকে নতুন দেশে এসে কোনোরকম সমস্যার মুখে পড়তে হয়নি।[২০] এরা নিজেদের খরচে বাড়ি ভাড়া নিতেন বা কিনতেন এবং কারোর উপর নির্ভরশীল হতে চাইতেন না। মধ্য ও নিম্ন- মধ্যবিত্ত শরণার্থীদের পর্যাপ্ত অর্থ না থাকলেও আত্মনির্ভরশীল হবার মানসিকতা ছিল। তারা পরিত্যক্ত বাড়ি দখল করতেন কিংবা ফাঁকা জমিতে বসবাস শুরু করতেন। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শরণার্থীরা সম্পূর্ণভাবে সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১ লা জুনের মধ্যে ১১ লাখ হিন্দু দেশান্তরে গমন করেন।[২১] এদের মধ্যে প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার ছিল শহরের ভদ্রলোক এবং ৫ লাখ ছিল গ্রামীণ এলাকার হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। অবশিষ্ট অনেকের মধ্যে ছিল ব্যবসায়ী শ্রেণির লোক। প্রধানত, আতঙ্কের কারনেই চলে আসছিলেন হিন্দুরা; কিন্তু সে আতঙ্ক নিছক কাল্পনিক ভয় বা রটানো গুজব নয়। তারা বিশেষ করে ভয় পাচ্ছিলেন মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে। পথেঘাটে

মেয়েদের ওপর শারীরিক নির্যাতনের মতো ঘটনাও মাঝেমধ্যে ঘটেছিল। এছাড়া ছিল হিন্দুদের ধর্মস্থান ও ধর্মীয় উৎসবের ওপর আক্রমণ।[২২]

২০ই অক্টোবর ১৯৪৮ সালে *আনন্দবাজার পত্রিকায়* লেখা হয়- 'ব্যাপকভাবে হাঙ্গামা না হলেই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক বর্জন, কয়েকটি অঞ্চলে হিন্দুদিগকে ভীতিপ্রদর্শন এবং হাঙ্গামার আশঙ্কাই পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদিগের বাস্তুত্যাগের কারণ'। সংবাদের সঙ্গে কয়েকটি ঘটনারও উল্লেখ করা হয়। রামগোপাল নাথ নামে জনৈক কৃষকের জমির ধান নষ্ট করে দিয়েছে। নোয়াখালীতে জনৈক শশিভূষণ দে-র কন্যাকে মুসলমানরা বিয়ে করবে বলে হুমকি দিয়েছে।[২৩] দেশভাগের পর কিছু সময়ের জন্য উদ্বাস্তু আগমন দ্রুত বেড়ে যায় এবং ১৯৪৭-এর শেষের দিকে এই সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ২.৪৬ লক্ষ। কিছু নথিতে এই সংখ্যা ৩.৪৪ লক্ষ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হাইদ্রাবাদে 'অপারেশন পোলো' শুরু হলে শরণার্থী আগমন পুনরায় বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতার পর প্রথম এক বছরে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল আনুমানিক ১০ লক্ষেরও বেশি। ১৯৪৮ এর জুলাই থেকে অক্টোবর এই চার মাসে গড়ে প্রতি মাসে এসেছিলেন প্রায় ১৪,০০০ মানুষ। শুধু আগস্ট মাসেই শরণার্থীর সংখ্যা ছিল ১৯,০০০; সেপ্টেম্বরে ১৮,০০০। অক্টোবরের মাঝামাঝি নাগাদ গড়ে প্রতিদিন আসছিলেন প্রায় ৩০০ মানুষ। কয়েক দিনের হিসাবঃ ১০ অক্টোবর- ৪৭৪; ১২ অক্টোবর- ২৩৮; ১৩ অক্টোবর- ৪৩৭; ১৪ অক্টোবর- ৪৩৬; ১৫ অক্টোবর- ৩৩৭। কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন বাস্তুহারা মানুষেরা ভিড়ে যায় এই সময়। *আনন্দবাজার পত্রিকার* বিবরণ- 'আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলি পরিবার ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াবার স্থানের পাশে রান্না করিতেছে। উহার খানিকটা দূরে ধুলিধূসর রাস্তার পাশে অন্যান্যরা তাদের রাত্রির আহার প্রস্তুত করিতেছিল'। ২৪ সে অক্টোবর আনন্দবাজারের সংবাদ শিরোনাম হয় 'উদ্বাস্তু আগমন'।[২৪] পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় স্বীকার করেন যে, প্রতিদিনই হিন্দুরা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে আসছেন। তাঁর হিসেবে, এ-পর্যন্ত উদ্বাস্তুর সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ; কংগ্রেস নেতা সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জির হিসেবে অবশই ওই সংখ্যা ২০ লক্ষ বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯৪৮ এর শেষে শরণার্থী-শিবিরেই আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রায় ৪০,০০০ মানুষ; অন্যত্র ছিলেন আরও দুই লক্ষ। ১৯৪৯ এর শেষে শিবিরে ছিলেন প্রায় ৭০,০০০ বাস্তুহারা মানুষ।[২৫]

১৯৪৮ সালে সরকারি ক্যাম্পে শরণার্থীদের ভর্তির হার নিম্নে দেওয়া হল-

মাস	সরকারি ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের সংখ্যা
জুলাই	৮,৪০৮
আগস্ট	১৯,১০৯
সেপ্টেম্বর	১৮,৬৩৮
অক্টোবর	৯,১৮২

১৯৪৮ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রতিদিন প্রায় ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ শরণার্থী পূর্ব-পাকিস্তান ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে পৌঁছাত। ১৯৪৮ সালের শেষে প্রায় ১৩ থেকে ১৫ লক্ষ মানুষ পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করেছিল। ১৯৪৯ সালের এপ্রিলের মধ্যে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২০ লক্ষের কাছাকাছি। এর মধ্যে ১০ লক্ষ মানুষ কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার বিভিন্ন ক্যাম্প ও কলোনিতে বসবাস করেছিল।[২৬]

১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দ্বিতীয় পর্যায়ের অভিবাসন

বিভিন্ন প্রতিবেদনে পূর্ব-পাকিস্তানে সংঘটিত নৃশংসতার বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন- ধর্ষণ, জোরপূর্বক ধর্মান্তর, হত্যাকাণ্ড, চাঁদাবাজি, অগ্নিসংযোগ এবং উপাসনালয়ের ধ্বংস। এসব ঘটনাই গণপলায়নের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়। *'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড'* পত্রিকার ১৯৪৯ সালের ২২ই নভেম্বর উল্লেখ করা হয় যে, পূর্ববঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি নির্বিচারে দখল করা হচ্ছিল, এবং সামরিক সহায়তায় মুসলমানদের সেইসব ঘরবাড়ি

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427450

দখলের সুযোগ দেওয়া হচ্ছিল। প্রতিবেদনে আরও বলা হয় যে, সিলেট, রাজশাহী, এবং চাঁদপুর অঞ্চলে তথাকথিত 'মুহাজির' বা অভিবাসিত সম্প্রদায় হিন্দুদের বাড়িঘর দখল করতেছিল।[২৭] ফলস্বরূপ, সংখ্যালঘু হিন্দু জনগণ পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের প্রতি গভীর ভীতি অনুভব করে, এবং বৃহৎ সংখ্যায় হিন্দু ভারতে অভিবাসন করে। দৈনিক *'বসুমতি'* পত্রিকায় ১৯৫০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি উল্লেখ করা হয় যে, পাবনা জেলার জেলা মাজিস্ট্রেট মিঃ এমদাদ আলি উল্লাপাড়া নামে এক মুসলিম গ্রামের সভায় ঘোষণা করেন যে- 'পাকিস্তানে অমুসলিমদের কোনো স্থান নেই; ইসলামই হবে রাষ্ট্রের স্বীকৃত ধর্ম'। এই ঘোষণা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সরকার 'কালশিরা হত্যাকাণ্ডের' প্রসঙ্গ উত্থাপন করে- যা ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কালশিরা গ্রামে সংঘটিত হয়।[২৮] এটি ছিল খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার মধ্যে একটি অন্যতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, যা পরবর্তীকালে খারিয়া, বেনয়াবারি, রুইয়া, ডুমুরিয়া, রায়রকুল, চিতলমারী, আন্ধার মানিক ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৯ সালের এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পাকিস্তানি পুলিশ কমিউনিস্ট সন্দেহভাজনদের অনুসন্ধান করতে গিয়ে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়, ফলে বহু মুসলমান, হিন্দু ও সাঁওতাল প্রাণ হারায়। ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে খুলনা জেলার বাগেরহাট মহকুমার সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশরত হিন্দু উদ্বাস্তুরা নানাপ্রকার নির্যাতনের শিকার হয়। শুধুমাত্র জানুয়ারি মাসেই প্রায় ১২,০০০ উদ্বাস্তু- যাদের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী ও তপসিলি জাতিভুক্ত- চব্বিশ পরগণার বনগাঁ এলাকায় এসে পৌঁছায়, যেখানে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৫০০ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছিল।[২৯]

১৯৫০- এর গোড়ার দিকেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি ঘটলে বিপুল সংখ্যক হিন্দু উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে শুরু করে। তৎকালীন সময়ে কলকাতামুখী উদ্বাস্তুদের পথে বিভিন্ন বাঁধা সৃষ্টি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ গামী ট্রেন বাতিল করা হয়, সীমান্ত ও মধ্যবর্তী স্টেশনে জোরপূর্বক আটকে রাখা হয়, এবং কাস্টমস অফিসার ও 'আনসার' সদস্যরা তল্লাশির নামে উদ্বাস্তুদের উপর অমানবিক নির্যাতন চালায়। এসবই হিন্দু উদ্বাস্তুদের প্রতি চলমান নিপীড়নের উদাহরণ ছিল। ভারতের সংসদে কংগ্রেস সদস্য শ্রী সতীশচন্দ্র সামন্ত কর্তৃক ১৯৫০ সালের ১৬ই মার্চ উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নয়াদিল্লিকে একটি প্রতিবেদন পাঠায়, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়।[৩০] টেলিগ্রাম, ১১ই মার্চ ১৯৫০ "১৩ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৮ই মার্চ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ থেকে বনগাঁ ও রানাঘাট সীমান্ত স্টেশনের মধ্যে দিয়ে হিন্দু উদ্বাস্তুদের আগমন ঘটে। এই সময়ে মোট ৯৮,৮৬০ জন উদ্বাস্তু আগমন করেন, যাদের মধ্যে ২৫,৩৭৯ জন বনগাঁয় এবং ৭৩,৪৮১ জন রানাঘাটে পৌঁছায়।[৩১] এর আগে, ১ই জানুয়ারি থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আরও ৩৪,৯১৫ জন উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে। ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে যায়। এই পরিসংখ্যান মূলত সীমান্তবর্তী ছোট স্টেশনসমূহ এবং আসাম ও ত্রিপুরায় আগমনকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়"। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে ১.৮ মিলিয়ন মানুষ নিজেদের ঘর ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গমুখী হয়।

শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নয়, বরং অর্থনৈতিক সংকটের কারণেও পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু উদ্বাস্তুরা চলে এসেছিল। সেই সময় পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন জিনিসের দাম অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল। চালের দর উঠেছিল প্রায় ৫০ টাকা মণ; পশ্চিমবঙ্গে তখন এক মণ চালের দাম ছিল ২১ টাকা। কাপড়ের দামও খুব বেশি ছিল সেই সময় পূর্ববঙ্গে। শুধুমাত্র হিন্দুরা নয় বরং এই সময় অর্থনৈতিক সংকটের কারণে মুসলিমরাও পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৮ *আনন্দবাজার পত্রিকার* সংবাদ শিরোনাম ছিল- 'পূর্ববঙ্গ থেকে মুসলমানসহ বহু লোকের প্রত্যহ পশ্চিমবঙ্গে আগমন'। পূর্ববঙ্গ সরকারের বক্তব্য ছিল, নির্যাতনের জন্য নয়, বরং আর্থিক উন্নতির স্পৃহায়, 'সাহায্য পাবার আশায়' হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে চলে যাচ্ছেন। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য না হলেও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। অবস্থাপন্ন হিন্দুরা চলে আসার ফলে কারিগর শ্রেণির লোকেদের অবস্থা একেবারে সঙ্গীন

হয়ে পড়েছিল, তাদের হাতে আর অবশিষ্ট কোনো কাজ ছিল না। ২০ অক্টোবর *আনন্দবাজার পত্রিকায়* শিশির ঢুলি নামে এক বাদ্যকারের বিবৃতি ছাপা হয়। প্রতিবেদকের বক্তব্য ছিল- 'বাবুরা' চলে গেছে, কাজ নেই; অতএব সে-ও চলে এসেছে।[৩২]

১৯৫০ সালে সরকারি ক্যাম্পে শরণার্থীদের সংখ্যা

মাস	সরকারি ক্যাম্পে শরণার্থীদের সংখ্যা
জানুয়ারি	১১৫০
ফেব্রুয়ারি	১০০২
মার্চ	৭৫,৫৯৬
এপ্রিল	১৪,৯৬০
মে	২৭,৪৪০

১৯৫০ সালের 'ইন্দো- পাকিস্তান চুক্তি' সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের প্রবাহ কমেনি।[৩৩] এইসময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, হিন্দুরা ১ই জানুয়ারি, ১৯৫০, ২৩ই মার্চ, ১৯৫০ সালে বিভিন্ন পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে, নীচে বর্ণনা করা হল-

ট্রেনের মাধ্যমে কলকাতায় এসেছেন- ২,৮৬,৬৯৭ জন,

আকাশপথের মাধ্যমে কলকাতায় এসেছেন- ১৫,৭২৪ জন,

স্টিমারের মাধ্যমে কলকাতায় এসেছেন -৪৪৪ জন,

ট্রেন এবং হাঁটা পথের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন - ১,১৯,৭৬৩ জন।

সর্বমোট- ৪,২২,৬২৮ জন।

১৯৫০ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে দাঙ্গার ফলে ঢাকা থেকে এসেছেন- ৫৪,৩৭৫ জন।

সরকারি ক্যাম্পে উদ্বাবাস্তুদের প্রবেশ

বছর	মাস	সরকারি ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা
১৯৫১	জানুয়ারি	৪৩৯৯
১৯৫১	ফেব্রুয়ারি	৪২১৫
১৯৫১	মার্চ	৫১১৭

পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের পালিয়ে যাওয়ার কারণ, ১৯৪৬-১৯৭০ (লক্ষ হিসেবে)[৩৪]

বছর	আগমনের কারণ	মোট
১৯৪৬	নোয়াখালী দাঙ্গা	১৯,০০০
১৯৪৭	দেশবিভাগ	৩৩৪,০০০
১৯৪৮	ভারতের হাইদ্রাবাদে 'পুলিশী ব্যবস্থা'	৭৮৬,০০০
১৯৪৯	খুলনা ও বরিশালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা	২১৩,০০০
১৯৫০	ঐ	১,৫৭৫,০০০

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427450

১৯৫১	কাশ্মীরে আন্দোলন	১৮৭,০০০
১৯৫২	অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি; সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, পাসপোর্ট ভীতি	২২৭,০০০
১৯৫৩	-	৭৬,০০০
১৯৫৪	-	১১৮,০০০
১৯৫৫	সাধারণ ভাষা হিসেবে উর্দু ঘোষণা করার জন্য উত্তেজনা	২৪০,০০০
১৯৫৬	পাকিস্তানে ইসলামি সংবিধান গ্রহণ	৩২০,০০০
১৯৫৭	-	১১,০০
১৯৫৮	-	১,০০০
১৯৫৯	-	১০,০০০
১৯৬০	-	১০,০০০
১৯৬১	-	১১,০০০
১৯৬২	-	১৪,০০০
১৯৬৩	-	১৬,০০০
১৯৬৪	হজরতবাল ঘটনায় দাঙ্গা	৬৯৩,০০০
১৯৬৫	ভারত- পাক যুদ্ধ	১০৮,০০০
১৯৬৬	-	৮,০০০
১৯৬৭	-	২৪,০০০
১৯৬৮	-	১২,০০০
১৯৬৯	-	১০,০০০
১৯৭০	আর্থিক দুর্দশা ও আগামী নির্বাচন	২৫০,০০০
মোট	-	৫,২৮৩,০০০

সূত্রঃ পি. এন. লুথরা, রিহ্যাবিলিটেশন, পাবলিকেশনস ডিভিশন, নিউ দিল্লি, ১৯৭২, পৃঃ ১৮-১৯।

অতিরিক্ত হিন্দু এসে আবার ফিরে গেছে- ৩,৬৮,২৫৩ জন। তবে বাস্তবে এই চুক্তির প্রভাব ছিল সীমিত। কিছু শরণার্থী ফিরে গেলেও অধিকাংশ পরে আবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসেন। ১৯৫১ সালের শেষে রাজ্যে পুনর্বাসন দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২০ লক্ষ অভিবাসী বসবাস করেছিলেন। নেহরু- লিয়াকত চুক্তির পর এইসময় দুই দিক থেকেই হিন্দু- মুসলিম উদ্বাস্তুদের আগমন হয়।

পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগমন[৩৫]

হিন্দু

বছর	উদ্বাস্তুদের সংখ্যা
১৫.০৭. ১৯৫০	৯,৮৬,২৭০
১৬.০৭. ১৯৫০ থেকে ৩১.০৭. ১৯৫০	১,২০.৮৮১
১.৮. ১৯৫০ থেকে ৩১.০৮. ১৯৫০	৮,০৯,৫৯৬
১.৯. ১৯৫০ থেকে ৩০.৯. ১৯৫০	১,৭২,৮৭১
১.১০. ১৯৫০ থেকে ৩১.১০. ১৯৫০	১,৭২,৫১৮
মোট	১৬,৬২,১৩৬

মুসলিম

বছর	উদ্বাস্তুদের সংখ্যা
১৫.০৭. ১৯৫০	২,১৯,০৯৬
১৬.০৭. ১৯৫০ থেকে ৩১.০৭. ১৯৫০	৫২,৮১৪
১.৮. ১৯৫০ থেকে ৩১.০৮. ১৯৫০	৯২,৬১৬
১.৯. ১৯৫০ থেকে ৩০.৯. ১৯৫০	৯১,৭৬১
১.১০. ১৯৫০ থেকে ৩১.১০. ১৯৫০	৮৩,৮৫৬
মোট	৫,৪০,১৪৩

পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে আগমন

হিন্দু

বছর	উদ্বাস্তুদের সংখ্যা
১৫.০৭. ১৯৫০	৪,৪৩,৬৭৩
১৬.০৭. ১৯৫০ থেকে ৩১.০৭. ১৯৫০	১,০৩,৪৮১
১.৮. ১৯৫০ থেকে ৩১.০৮. ১৯৫০	১,৮৩,১৫৯
১.৯. ১৯৫০ থেকে ৩০.৯. ১৯৫০	১,৭৪,৪৩২
১.১০. ১৯৫০ থেকে ৩১.১০. ১৯৫০	২,২৬,৩১৮
মোট	৯,০৪,৭৭২

মুসলিম

বছর	উদ্বাস্তুদের সংখ্যা
১৫.০৭. ১৯৫০	২,৯৩,৮৩৯
১৬.০৭. ১৯৫০ থেকে ৩১.০৭. ১৯৫০	৩৭,৭১৪
১.৮. ১৯৫০ থেকে ৩১.০৮. ১৯৫০	৭১,০৩১
১.৯. ১৯৫০ থেকে ৩০.৯. ১৯৫০	৭৩,৪৩৬
১.১০. ১৯৫০ থেকে ৩১.১০. ১৯৫০	৭৬,২৪৮
মোট	৪,৭৬,০২০

পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু উদবাস্তুরা নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, ও কলকাতায় সবচেয়ে বেশি এসেছিল। খুলনা পাকের বাগেরহাট জেলার চিতলমারি ইউনিয়ন থেকে প্রায় ৩০০টি পরিবার, যাদের অধিকাংশই নমঃশূদ্র ছিল, পাকিস্তান পুলিসের (আনসার বাহিনী ও স্থানীয় মুসলমানদের দ্বারা) সংঘটিত নানা ধরণের নির্যাতনের কারণে বনগাঁতে এসে আশ্রয় নিয়েছে বলে জানা গেছে। ১৯৫১ সালের মধ্যে প্রায় পাঁচ লাখ উদ্বাস্তু নদীয়ায় বসতি স্থাপন করে। নদীয়ার একটি গ্রামে উদ্বাস্তুরা কেন পূর্ববঙ্গ থেকে পালিয়ে এসেছিল তার কারণ নিচে বর্ণনা করা হল।[৩৬]

পলায়নের কারণ	পরিবারের সংখ্যা
মুসলিমদের দ্বারা হয়রানি	৮২
আক্রমণের ভয়	৪১

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427450

তারা মনে করে অথবা তাদের বলা হয় যে, পাকিস্তান মুসলিমদের জন্য এবং ভারত হিন্দুদের জন্য	২৩
কারণ সবাই পালিয়ে গিয়েছিল	১৬
প্রকৃত আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত	৯
ব্যবসা/লেখাপড়া	৭
বন্যা/নদী ভাঙ্গন	৫
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনীহা	৩

সুত্রঃ টেটসুয়া নাকাতানি, অ্যাওয়ে ফ্রম হোমঃ দি মুভমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অফ রিফিউজিস ফ্রম ইস্ট পাকিস্তান ইনটু ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়া, *জার্নাল অফ দ্য জাপানিজ অ্যাসোসিয়েশন ফর সাউথ এসিয়ান স্টাডিজ*, ১২ (২০০০), পৃ-৮৮।

নদীয়া সীমান্তের কাছাকাছি নমঃশূদ্রদের আসা নিয়ে টেটসুয়া নাকাতানির গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, এ গ্রামে আশ্রিত পরিবারগুলির প্রায় অর্ধেকই আসে 'আত্মীয়ের মাধ্যমে'।[৩৫] এসব আত্মীয় উদ্বাস্তুদেরকে প্রাপ্ত জমি কেনা বা ভাড়া নেওয়ার বিষয় সম্পর্কে সহায়তা প্রদান করে। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তারা ছিল মহিলা আত্মীয়- বিবাহিত কন্যা বা বোন, ঠাকুরমা-দিদিমা বা পিসীমা-মাসিমা। এরাই তাদেরকে বসতি স্থাপনে সহায়তা করে।[৩৭]

নদীয়ার 'এম' গ্রামে আসার কারণ

নদীয়ার 'এম' গ্রামে বসতি স্থাপনের কারণ	পরিবারের সংখ্যা
সেখানে আত্মীয় (পিতার দিক থেকে) ছিল	৩৫
সেখানে আত্মীয় (সাদৃশ্য) ছিল	৩১
সেখানে আত্মীয় (মাতার দিক থেকে) ছিল	১৭
সেখানে একই এলাকার লোক ছিল	১১
সেখানে একই জাতির লোক ছিল	৯
সেখানে দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ছিল	৫
মুসলমানদের সঙ্গে সম্পত্তি বিনিময় করে	১৪
ব্যবসা বা চাকরি করে	১৩
সরকারি পুনর্বাসন দ্বারা	৭
কোনো যোগাযোগ ছাড়াই	১৯
অন্যান্য কারণ	১৩
অজ্ঞাত	১৪
মোট	১৮৮

সুত্রঃ টেটসুয়া নাকাতানি, অ্যাওয়ে ফ্রম হোমঃ দি মুভমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অফ রিফিউজিস ফ্রম ইস্ট পাকিস্তান ইনটু ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়া, *জার্নাল অফ দ্য জাপানিজ অ্যাসোসিয়েশন ফর সাউথ এসিয়ান স্টাডিজ*, ১২ (২০০০), পৃ-৮৯।

১৯৫২ সালের ১৫ই অক্টোবর পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু হবার ফলে সংখ্যালঘু হিন্দুদের মধ্যে এক নতুন আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। প্রথমত, তাঁরা মনে করেন যে, দেশবদলের এই সরকারি প্রক্রিয়ার ফলে তাঁদের কোনো নতুন দাঙ্গার হাত থেকে পালাবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। বিগত অভিজ্ঞতা থেকে তাদের দৃঢ় ধারণা হয় যে, এক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার তাদের কোনো সাহায্য করবে না। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু

হবার ঠিক আগে, অক্টোবর মাসের প্রথম দশদিনে ৯৪,১০৯ জন হিন্দু এবং ৩১,৬৬৯ জন মুসলিম এদেশে চলে আসেন। ১৯৬০- ৬১ সালে আবার অভিবাসন শুরু হয়। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭ সালে পুনর্বাসন মন্ত্রনালয় একটি অফিসিয়াল তথ্য প্রকাশ করে।[৩৮]

১৯৫২ সালে সরকারি ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা

মাস	সরকারি ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা
জুলাই	১১,৬০০
আগস্ট	৭৮০০
সেপ্টেম্বর	১০,৬৫৪
অক্টোবর	৩১,৭৫৩
নভেম্বর	১৭১৫
ডিসেম্বর	৭৫৫

(১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭) সালে পূর্ব-পাকিস্তানের বাস্তুচ্যুত মানুষদের অন্তঃপ্রবাহ[৩৯]

মাস	১৯৫৩	১৯৫৪	১৯৫৫	১৯৫৬	১৯৫৭
জানুয়ারি	৬,১৬৪	৮,৭৬৯	১৭,০৫৮	১৯,১২০	২,০০৫
ফেব্রুয়ারী	৭,৫৮২	৬,৯১২	২৪,৮৩০	৫০,০৫৯	২,৮৭০
মার্চ	৯,৫৭৬	৭,০৩৫	৩০,১৮৭	৫৫,০৩৮	১,২৬৬
এপ্রিল	৮.৮৯০	৬,৮৪৯	১৯,৩৭৬	২২,৭৫২	-
মে	৭,৮৮২	৭,৮৫৫	২০,৯৭৮	৩০,৯৭২	-
জুন	৬,১২৩	৯,০০০	২০,৯৭৮	৩০,৮৮২	-
জুলাই	৬,২৬৮	৬,৮৮৯	২৫,২৯১	৩৮,০৩০	-
আগস্ট	৫,৩০০	৮,৩১২	১৫,৪১২	৪৭,০৫৬	-
সেপ্টেম্বর	৩,৯৭৪	১১,২৮৯	১০,৯৬৬	১৬,৮৪২	-
অক্টোবর	৫,০৩৬	১১,৮২৪	১৬,৮৪৮	৫,০৮৮	-
নভেম্বর	৪,০৮১	১৩,২০২	১৩,০৫০	২,২২৫	-
ডিসেম্বর	৪,১৯৭	২৫,৫৫৫	২৩,৭০৪	২,৩২৯	-
মোট	৭৬,৩২০	১১৭,০৩১	২৩৯,০০১	৩১৯.৩২৬	৯,৪৮১

সুত্রঃ মিনিস্টারি অফ হোম এফেয়ার্স, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, বার্ষিক রিপোর্ট, (১৯৫৮), পৃ- ৩৯।

পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু হবার পরও শরণার্থী আগমন বন্ধ হয়নি। ১৯৫২ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত গড়ে প্রতি মাসে প্রায় ২,০০০ শরণার্থী সরকারি শিবিরে আশ্রয় নেন। ১৯৫২ সালের মে মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় ২৫ লক্ষের কাছাকাছি। ১৯৫৩ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে শরণার্থী প্রবাহ অব্যাহত থাকে। বিশেষত ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427450

শরণার্থী সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে এই প্রবাহ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পোঁছায়। পরবর্তীকালে অভিবাসন শংসাপত্র চালু হওয়ায় এবং নতুন করে হিংসা ছড়িয়ে পড়ায় এই প্রবাহ কিছুটা হ্রাস পায়।[৪০]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও তৃতীয় পর্যায়ের বাস্তুচ্যুতি

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে ৫৫ হাজার হিন্দু উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। এইসময়ে ১৯৬৩ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৩৮ লাখ হিন্দু উদ্বাস্তু অবস্থান করেছিল। খুলনা, ঢাকা, যশোর, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য অঞ্চলে সংঘটিত দাঙ্গার ফলে ১৯৬৪ সালে প্রায় ১৮,০০০ মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেন। ১৯৬৪ সালে কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ থেকে রহস্যজনকভাবে খোয়া গিয়েছিল পয়গম্বর মোহম্মদের কেশ। এর ফলে ভারত-পাকিস্তান দুই- দেশেই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হয়নি। পূর্ব-পাকিস্তানের খুলনা, ঢাকা, যশোর, চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে।[৪১] যার ফলস্বরূপ থিতিয়ে আসা সেই পলায়ন প্রক্রিয়া চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল ফের। এই সময় ১৮ হাজার মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করেন। দেশভাগ-পরবর্তী প্রায় আড়াই দশকে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ঘর-গৃহস্থালি ছেড়েছিলেন প্রায় ৫২ লক্ষ ৮৩ হাজার মানুষ। পরবর্তীকালে তাঁদের ৩৯ লক্ষ ৫৬ হাজারের বসতই ছিল পশ্চিমবঙ্গে। ১৯৬৫ সালের ভারত- পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ও প্রচুর পরিমাণে অভিবাসন হয়। ১৯৬৬ সালের প্রশাসনিক ও নিস্পত্তি আদেশ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম নিরাপত্তাহীনতা ও ভয়ের সৃষ্টি করেছিল। ফলে হিন্দু উদ্বাস্তুরা পুনরায় আসতে থাকে, ১৯৬৫, ও ১৯৬৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৪০ লক্ষ।[৪২]

পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুদের কালানুক্রমিক বণ্টনের অন্তঃপ্রবাহ

বছর	পশ্চিমবঙ্গ	অন্যান্য রাজ্য	মোট
১৯৪৬-৫২	২৫৮,০০০	৫৭৩,০০০	৮৩১,০০০
১৯৫৩	৬১,০০০	১৫,০০০	৭৬,০০০
১৯৫৪	১০৪,০০০	১৭,০০০	১২১,০০০
১৯৫৫	২১২,০০০	২৯,০০০	২৪১,০০০
১৯৫৬	২৪৯,০০০	৩৩,০০০	৫৮২,০০০
১৯৫৭	৪,০০০	২,০০০	৬,০০০
১৯৫৮	৫,০০০	০	৫০০০
১৯৫৯	৫,০০০	১,০০০	৬,০০০
১৯৬০	৯,০০০	১০,০০০	১৯,০০০
১৯৬১	১০,০০০	১,০০০	১১,০০০
১৯৬২	১৩,০০০	১,০০০	১৪,০০০
১৯৬৩	১৪,০০০	২,০০০	১৬,০০০
১৯৬৪	৪১৯,০০০	২৭৮,০০০	৬৯৭,০০০
১৯৬৫	৮১,০০০	২৬,০০০	১০৭,০০০
১৯৬৬	৮,০০০	৮,০০০	১৬,০০০
১৯৬৭	৫,০০০	১৯,০০০	২৪,০০০
১৯৬৮	৪,০০০	৮,০০০	১২,০০০
১৯৬৯	৪,০০০	৬,০০০	১০,০০০

১৯৭০	২৩৩,০০০	১৮,০০০	২৫১,০০০
১৯৭১ (মার্চ)	৭,০০০	২,০০০	৯,০০০
মোট	৩৫৫,০০০	১,৩৩৩,০০০	৫,২৯২,০০০

সুত্রঃ [গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ১৯৭৬, অ্যাপেন্ডিক্স- ১১১]

১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালেও শরণার্থী প্রবাহ অব্যাহত থাকে এবং পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীর সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৪০ লক্ষ। সরকারি তথ্য অনুযায়ী ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই সংখ্যা ছিল প্রায় ৪২.৫৯ লক্ষ। এই সময়ে শরণার্থী আগমন ধীর হলেও কখনই সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়নি। শেষ ও বৃহৎ পর্যায়ের উদ্বাস্তু আগমন ঘটে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে।[৪৩]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং অভিবাসনের শেষ পর্যায়

ভারত বিভাজনের পর পূর্ববাংলা পাকিস্তানের অংশ হলেও সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ও রাজনৈতিক দিক থেকে এই অঞ্চলটি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ছিল। এই স্বতন্ত্র পরিচয় থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানে ক্রমশ রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভাবে জয়লাভ করে। ১৬৯ টি আসনের মধ্যে তারা ১৬৭ টি আসনে বিজয়ী হয় এবং সরকার গঠনের দাবি তোলে। দলের নেতা ছিলেন সেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো সেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য পৃথক প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের প্রস্তাব দেন।[৪৪] এই প্রস্তাব পূর্ব-পাকিস্তানে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং 'এক ইউনিট নীতির' বিরোধিতা করতে শুরু করে। ১৯৭১ সালে সেখ মুজিব এক ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার ডাক দেন। এর পরপরই পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী ২৫ই মার্চ ১৯৭১ 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে একটি পরিকল্পিত সামরিক অভিযান শুরু করে। ২৬ই মার্চ ১৯৭১ সালে আওয়ামী লীগের নেতা হান্নান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। একই বছর জুলাই মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রকাশ্যে এই নতুন রাষ্ট্রকে 'বাংলাদেশ' নামে স্বীকৃত দেন, যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় পাকিস্তান থেকে সরে এসে নতুন দেশ হিসেবে জন্ম নেয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ; এবং দেশ গঠনের সুতোয় জড়িয়ে ফের উঠে আসে সেই চেনা শব্দবন্ধ, উদ্বাস্তু উৎপাদন। বাংলাদেশ গঠনের পরে উদ্বাস্তুদের সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমুখ ছিল ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গ। সরকারি নথিতে দেখা গেছে যে, ১৯৭১ সালে যুদ্ধ- দীর্ণ বাংলাদেশ থেকে এ রাজ্যে এসেছিলেন প্রায় ২ লক্ষ ৩২ হাজার শরণার্থী।[৪৫] এই সময়ে ১ কোটি মানুষ সীমানা অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নেন, এবং প্রায় ৩ কোটি মানুষ দেশের ভেতরেই বাস্তুচ্যুত হন। এই শরণার্থীর প্রায় ৮০ শতাংশই ছিলেন হিন্দু। এই পর্বে অবাঙালি মুসলিম শরণার্থীদের অনেকেই অবশ্য পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আশ্রয়ের আশায় পাড়ি দিয়েছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৭১ সালের জনগণনায় দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নদীয়া, চব্বিশ পরগণা জেলায় সবথেকে বেশি উদ্বাস্তুদের ঢল নামে। তবে কলকাতায় শরণার্থীর সংখ্যা কিছুটা কমে যায়, কারণ জমি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তখন প্রায় সম্পূর্ণভাবে কমে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে সরকার বহু শরণার্থীকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্যান্য রাজ্যে স্থানান্তরিত করেন।[৪৬]

১৯৭১ সালের সেনসাস ও পশ্চিমবঙ্গের বিভন্ন জেলায় উদ্বাস্তুদের সংখ্যা[৪৭]

জেলা	উদ্বাস্তুদের সংখ্যা	শতকরা হার
২৪ পরগণা (উত্তর ও দক্ষিণ)	১,৬৫০,০০০	২২.৩
নদীয়া	১,৫০০,৭৫০	২০.৩
কলকাতা	৯০০,০০০	১২.৩

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427450

কোচবিহার	৪৪২,০০০	৫.৯
দিনাজপুর (উত্তর ও দক্ষিণ)	২৯২,৫০০	৩.৩
জলপাইগুড়ি	২৮৯,০০০	৩.৩
বর্ধমান	২৮০,০০০	১৯.১
বাঁকুড়া	১,৪১৫,৭৫০	২.৮
হুগলী	১৪৪,০০০	১.৮
মুর্শিদাবাদ	১৩৫,০০০	১.৮
মালদা	১২৭,৫০০	১.৭
মেদিনীপুর	৬৩,০০০	০.৮
দার্জিলিং	৪৮,০০০	০.৬
বীরভূম	১৫,০০০	০.২
পুরুলিয়া	৯৭৫	০.২
হাওড়া	১৪৪,০০০	০.২
মোট	৭,৩৮২,৪৭৫	১০০.২

সূত্রঃ সেনসাস রিপোর্ট (১৯৭১)

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে শরণার্থী সংক্রান্ত সমস্যাগুলি বিশ্লেষণের জন্য শরণার্থী পুনর্বাসন কমিটি গঠন করা হয়।[৪৮] এই কমিটি ১৯৭১ সালের জনগণনা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে জানায় যে, পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীর সংখ্যা ছিল ৭৩.৮২ লক্ষ। এরপর শরণার্থী পুনর্বাসন কমিটি নিজস্ব সমীক্ষা শুরু করে এবং অনুমান করে যে, পশ্চিমবঙ্গে বসবাসরত শরণার্থীর সংখ্যা ছিল ৭৫ লক্ষ। এর মধ্যে প্রায় ২.১ লক্ষ শরণার্থী সরকার-পরিচালিত শিবিরের বাইরে বসবাস করেছিলেন। যদি মোট শরণার্থীর সংখ্যা বিবেচনায় আনা হয়, তবে অনুমান করা হয় যে, ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীর সংখ্যা ছিল আনুমানিক প্রায় ৭৭ লক্ষ বা ৮০ লক্ষ।[৪৯]

শহরের ফুটপাতে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আশ্রয় জুটল এই বাস্তুহারাদের। শিয়ালদহ (দক্ষিণ) স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ভরে গেল বাস্তুহারাদের ভিড়ে। শিয়ালদহ স্টেশনে ভলেন্টিয়ারের হাতে চিঁড়ে গুড়ের ঠোঙা ধরিয়ে দিয়ে বলল, কোন ক্যাম্পে যাবেন? ক্যাম্প? সেই ইচ্ছামতি নদীর তীরের বটের ছায়া থেকে কলকাতার ক্যাম্প।[৫০] প্রথমে কলেরার টিকা নেওয়া, তারপর পুনর্বাসন দপ্তরের কাছে এক টুকরো কাগজ (সার্টিফিকেট) নিয়ে শরণার্থী শিবিরে যাওয়ার জন্য প্রতীক্ষা। সরকারি রিলিফ ভ্যান এসে প্রতিদিন গড়ে ৩০০ পরিবারকে শিবিরে নিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু নতুন একদল এসে সেই শূন্যস্থান পূরণ করে দিচ্ছে।[৫১] প্রতীক্ষার সময়টি কাটাতে হচ্ছে স্টেশনের চত্বরে, দড়ি দিয়ে ঘেরা সীমানার মধ্যে দিয়ে; চিড়ে-গুড় আর দিনে দু টাকা অনুদান সম্বল করে। পানীয়জল আর শৌচালয়ের ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। কলেরা- ডায়ারিয়া- ইনফ্লুয়েঞ্জার অবাধ আক্রমণ। রাস্তায় ইটের উনুনে রান্না, খোলা জায়গায় মেয়েদের স্নান, চটের পর্দার আড়ালে রমণীর সন্তানপ্রসব। 'ছিন্নমূল' চলচ্চিত্রে পুরো ধরা পড়েছে সেই বিরল দৃশ্য। প্রথমে পুনর্বাসন দপ্তর বলে কিছুই ছিল না; বিষয়টি দেখাশোনা করতেন নিকুঞ্জ মাইতি।[৫২] ১৯৪৯–এ দপ্তর খোলার পর দায়িত্ব নেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে; মহাধ্যক্ষ পদে আসেন দক্ষ প্রশাসক হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪৯- এর অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে মাত্র ২০,০০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়েছিল; কৃষিজীবীদের জমি দেওয়া হয়েছিল ১৫,০০০ একর।

বাংলায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বিষয়টি ভারত সরকার যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেনি, বরং তাদের ভিন্ন মনোভাব এক অমার্জনীয় প্রকাশ পেয়েছিল, এমন অভিযোগ বিভিন্ন মহল থেকে উঠে আসছিল। হিরন্ময়

বন্দ্যোপাধ্যায় এর ও সরোজ চক্রবর্তীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে; বিশদ আলোচনা করেছেন প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী। সরোজ চক্রবর্তী দেখিয়েছেন, 'মাসের পর মাস ভারত পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্বাস্তু- সমস্যার অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করতে চায়নি'।[৫৩] মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় বারবার সাহায্য চেয়েও বিফল হচ্ছিলেন; ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি বলে ওঠেন, 'মানুষের এই চরম দুর্ভোগের শেষ করতে হলে চাই এখন যুদ্ধ'। উদ্বাস্তুদের দাবি নিয়ে এই সময়ে বিশেষভাবে সরব ছিলেন ডঃ মেঘনাদ সাহা, যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকাও খুব উজ্জ্বল ছিল না। ১৯৫০-এর আগে কমিউনিস্ট পার্টিও কোনো বড়ো আন্দোলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ঐ বছরের আগস্টে প্রধানত বামপন্থীদের নেতৃত্ব উদ্বাস্তুদের সংগঠন 'উইনাইটেড সেন্ট্রাল রিফুইজি কাউন্সিল' বা ইউ. সি. আর. সি-এর জন্ম হয়।[৫৪] তার আগে ছিল 'নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্ম পরিষদ'- ১৯৪৯-এর জানুয়ারিতে কলকাতায় বাস্তুহারাদের মিছিলে সংগঠনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এই পরিষদই। শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের ভেতর দিয়েই উদ্বাস্তুরা আদায় করে নেন তাঁদের পুনর্বাসনের দাবি।[৫৫] ১৯৫০ এর পর শিবির গড়ে ওঠে ধুবুলিয়ায়, রানাঘাটে, ইউ. সি. আর. সি-এর নেতৃতে জবরদখল আন্দোলনের ফলে কলোনি গড়ে ওঠে সোদপুর, বেলঘরিয়া, নিউ ব্যারাকপুর এবং কৃষ্ণনগরের শক্তিনগর প্রভৃতি অঞ্চলে। সোদপুরের দেশবন্ধুনগরই ছিল প্রথম 'জবরদখল কলোনি'। বেলঘরিয়ায় গড়ে ওঠে যতীন দাস কলোনি। উদ্বাস্তুদের আত্মনির্ভরশীলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিল শক্তিনগর কলোনি; যার উদ্যোক্তা ছিলেন নরেন সরকার।[৫৬]

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল উদ্বাস্তুদের বিভিন্নভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। আমরা লক্ষ করেছি যে, তারা মূলত তিনটি জেলায় দলবদ্ধভাবে জড় হয় এবং নির্দিষ্টভাবে কলকাতায় বহু উদ্বাস্তু চলে আসতে থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চেয়েছিল এসব কেন্দ্রীভূত অবস্থাকে ভেঙে দিতে, যাতে উদ্বাস্তুরা বাংলার বাইরে 'খালি' জমিতে অধিক সংখ্যক বসতি নির্মাণ করতে পারে। কলকাতায় আসা হাজার হাজার উদ্বাস্তুকে বিভিন্ন স্থানে সরিয়ে দেওয়া সরকারের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়।[৫৭] শহরে প্রতিদিন উদ্বাস্তু আসা তখনো অব্যাহত ছিল। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় চেয়েছিলেন এই উদ্বাস্তু 'অগ্নিকুণ্ডকে' শহরের অন্যান্য 'দাহ্য' উপাদান থেকে যতদূর সম্ভব সরিয়ে রাখা এবং চারিদিকে তাদেরকে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। তিনি চেয়েছিলেন রাজধানীর বাইরে তাদের চলে যেতে অনুরোধ করা অথবা অন্য কোথাও যেতে বাধ্য করা। এ বিষয়গুলি ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসের পর সরকারের কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলে মনে হতে শুরু করে। ওই সময় শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্বাস্তুদের ওপর পুলিশ টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করলে ৯ জন লোক নিহত হয়, এবং তাদের পক্ষে ছাত্ররা বিক্ষোভ করে। সরকার এটা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় যে, বিশ শতকের বাংলার অত্যন্ত জনবহুল পরিবেশে চাষাবাদের উপযোগী আর কোনো জমি ছিল না। যেসব জমি খালি পড়ে ছিল তা দুঃখজনকভাবে অত্যন্ত নিম্নমানের ছিল। অধিকাংশ ক্যাম্প এসব স্থানেই তৈরি করা হয়। এসব এলাকায় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের কোনো সামাজিক যোগাযোগ ছিল না এবং এসব জমি থেকে সামান্য আয়ের বাইরে আর কোনো কাজের সম্ভাবনা ছিল না। এসব এলাকার জমি দখল করার ইচ্ছা উদ্বাস্তুদেরও ছিল না। বরং তারা কলকাতা ও অন্যান্য বড় শহরে চলে যেতে আগ্রহী ছিল। তারা মনে করেছিল যে, ওইসব স্থানে তারা তাদের জীবন নতুনভাবে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে।

এছাড়া, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে যে, ব্যাপক সংখ্যক আগত উদ্বাস্তুদের সবাইকে এ প্রদেশে বসবাসের ব্যবস্থা করার জন্য যথেষ্ট জমি নেই। সুতরাং তাদের জোর করে 'বিচ্ছিন্ন' করে দিতে হবে যেন এসব হতভাগ্যরা ভারতীয় ইউনিয়নের বিছিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে পারে। এ নীতির ক্ষুদ্র আকারের পরিকল্পনা শুরু হয় ১৯৪৮ সালে, এর উদ্ভাবক ছিলেন ডাঃ রায়। তিনি পরিকল্পনা

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427450

করেন যে, কয়েক'শ উদ্বাস্তু পরিবারকে বঙ্গোপসাগরের ওপারে ম্যালেরিয়াপ্রবণ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে।[৫৮] ওইসব স্থানে উদ্বাস্তুদের যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, এছাড়া ওইসব রাজ্যের সরকারগুলোও তাদের গ্রহণ করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। কারণ তারা এটাকে গণ্য করে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত মাথা ব্যথা হিসেবে। এসব নির্জন ও একেবারে অনুপযুক্ত স্থানগুলোতে কোনোরকম সহায়তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার বেদনায় উদ্বাস্তুরা পালিয়ে যায় এবং কলকাতা বা অন্য শহর বা বাংলার নগরগুলোতে ফিরে আসে। এসব স্থানে তাদের গণ্য করা হয় অকৃতজ্ঞ, 'পলাতক' ও অপরাধী হিসেবে। তথাকথিত ক্যাম্পগুলোতে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে বসতি নির্মাণের দাবিতে মাঝে মাঝে বহু প্রতিবাদ ও সত্যাগ্রহ করলেও সরকার তা মানতে অস্বীকার করেন। তারা বার বার বলে যে, উদ্বাস্তুরা ব্যবহার করতে পারে এমন কোনো জমি পশ্চিমবঙ্গে নেই।

১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পুনর্বাসনের খরচ তালিকা[৫৯]

জেলা	খরচ (১৯৪৯-৫০)	খরচ (১.৪.৫০ থেকে ৩০.১১.৫০)	মোট
বর্ধমান	২৫০	১৩,৯৮৯	১৪,২৩৯
বীরভূম	-	৬,৭০০	৬,৭০০
বাঁকুড়া	৭,০০০	৩৪,৫৪২	৪১,৫৪২
মেদিনীপুর	৪,০৫০	১১,২৬০	১৫,৩১০
হুগলী	৩,৭৮৮	৯,৭১৩	১৩,৫০১
হাওড়া	-	২,৩৬,২৪৮	২,৩৬,২৪৮
২৪ পরগণা	১৭৫	৩১,২৫৫	৩১,৪৩০
নদীয়া	-	৩১,৯০০	৩১,৯০০
মুর্শিদাবাদ	৬০০	-	৬০০
দিনাজপুর	-	-	-
মালদা	-	-	-
জলপাইগুড়ি	২৯,৯৯৪	২৬,০৫১	৫৬,০৪৫
দার্জিলিং	-	-	-
কোচবিহার	-	২৬০	২৬০
কলকাতা	৩,৩৯,৯৮৬	১৫৫,৮৯৩	৪,৯৫৮৭৯
মোট	৩,৮৫,৫৯১	৫,৫৭,৯৯১	৯,৪৩,৫৮৪

সূত্রঃ রিসেটেলমেন্ট অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন -মাইনরিটিস অ্যান্ড রিফুউজিস অফ ইস্ট বেঙ্গল, (ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট আর্কাইভ, হোম পলিটিকাল বিভাগ, এপ্রিল ১৯৫০, পৃ- ২৮৩-২৮৬

ভারতের স্বাধীনতা এবং তার ফলে সৃষ্ট বিভাজন ছিল বিশ্ব ইতিহাসের এক অন্যতম মর্মান্তিক ঘটনা। বাংলা ভাগ ও তার পরিণতি শুধু ভারতের অধিবাসীদেরই নয়, বরং প্রতিবেশী দেশগুলির মানুষের জীবনকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ভারতের স্বাধীনতার ফলে, দেশের পূর্ব অংশ দুটি পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে যায়। একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও দুই বাংলার মধ্যে আঞ্চলিক পরিচয়ের একটি ভিন্ন উপাদান কাজ করেছিল, যা দুই অঞ্চলের আলাদা পরিচিতি গঠনে অবদান রেখেছিল। বিভাজনের পর পূর্ব-পাকিস্তান থেকে অভিবাসন শুরু হয়, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু উদ্বাস্তু। এই অভিবাসন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধাপে সংঘটিত হয়েছিল। যা ১৯৪৬ সালের নোয়াখালী ও ত্রিপুরা দাঙ্গার পর থেকে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত চলেছিল। উদ্বাস্তুদের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসা এরপরও বন্ধ হয়নি এবং আজও তা অব্যাহত রয়েছে।

আশির দশকের শেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে ৫৫-৬০ হাজার চাকমা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ ত্রিপুরায় চলে আসেন। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলো থেকে পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসা মানুষের সংখ্যা ক্রমশও বাড়ছে এবং বর্তমানে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর যে নিপীড়ন চলছে, তা কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না। এই মর্মান্তিক বাস্তুচ্যুতি পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছিল। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার প্রাথমিকভাবে বাঙালি উদ্বাস্তুদের গ্রহন করে, এবং তাদের জন্য অস্থায়ী আশ্রম ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিল। তবে ধীরে ধীরে অভিবাসনের প্রবাহ বেড়ে গেলে সরকার উদ্বাস্তুদের প্রতি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেন। পশ্চিমবঙ্গে খালি জমির অভাবের কারণে সরকার অতিরিক্ত সংখ্যক উদবাস্তুদের রাজ্যের বাইরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। বাইরের রাজ্যে অবস্থিত শিবির থেকে উদ্বাস্তুদের পালিয়ে যাওয়া এবং পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসার ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। ফলে সরকারকে তাদের পুনর্বাসনের জন্য অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণ করতে হয়। সরকার-পরিচালিত কলোনির পাশাপাশি, অনেক ক্ষেত্রে জোরপূর্বক দখলিকৃত কলোনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে।[৬০]

এই প্রবন্ধে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের অভিজ্ঞতা ও পরিচয়কে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষভাবে উদ্বাস্তুদের **বিপর্যয়ের** দিনগুলির বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ তারা রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির শিকার হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে এলেও বাস্তবে তাদের স্থানান্তর ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া একটি ক্ষুদ্র ও স্থানীয় উপাদান দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। দেশভাগের বিনাশের দিক, মানে নেতিবাচক প্রভাবটায় বেশ বড়। অস্বীকার করার জায়গা নেই যে, হাজার হাজার অসহায় মানুষের মৃত্য ঘটিয়েছে দেশভাগ। সাজানো সংসার ধ্বংস করেছে। বেঁচে থাকার জন্য কদর্য পথে যেতে বাধ্য করেছে নিরুপায় মানুষদের। সরল সাধাসিধে মানুষগুলিকে লোভী অসৎ ধান্দাবাজ করেছে, মিথ্যার সহবাসি করেছে। আরও কত কি? কিন্তু আমরা বলতে পারি কিছু ইতিবাচক দিকও আছে দেশভাগের, যা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীরা সংস্কৃতির দিক থেকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিলেন। স্থানচ্যুতির সময় তারা নিজেদের সংস্কৃতি সঙ্গে বয়ে নিয়ে আসেন এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেন। রানিকুথি শিবিরের উদ্বাস্তরা তাদের ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের গভর্নরকেও সমৃদ্ধ করেছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত মানুষরা নিজেদের সংস্কৃতি, শ্রমশক্তি ও কৃষিজ দক্ষতা পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে আসেন। দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্প মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ অধিকাংশ পাটকল প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সংকটে পড়ে। এই বাস্তুচ্যুত কৃষকরা বিশেষ করে পাটচাষে তাদের অভিজ্ঞতা পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ তারা পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যবহৃত একই কৌশল ও পদ্ধতিতে পশ্চিমবঙ্গে পাটচাষ শুরু করেন। এই বিপন্ন মানুষগুলো বাঁচার প্রয়োজনে নিজের মতো করে ঠাই গড়ে নিয়েছে। নতুন পরিবেশে নিজেদেরকে নতুন করে অভিযোজিত করেছে।

সূত্রনির্দেশ:

১. Baral, Sayantika & Tuhin Ghosh, "Historical Influx of East Pakistan Refugees and Their Resettlement in West Bengal" (India): *Contemporary Social Physics, Springer Geography*, February 2025, pp. 31-52.

২. ঘোষ, সেমন্তী, *দেশভাগঃ স্মৃতি আর স্তব্ধতা,* কলকাতাঃ গাঙচিল প্রকাশনী, ১ই মার্চ ২০০৮, পৃঃ ১২-১৩।

৩. তদেব, পৃঃ ১৩-১৪।

৪. তদেব, পৃঃ ১৪-১৬।

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, *দেশভাগ- দেশত্যাগ,* প্রকাশক, অনিল আচার্য, অনুস্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ ৬৭।

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427450

৬. Chatterji, Joya, *Spoils of Partition: Bengal and India, 1947-1967*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 120-122.

৭. Ibid.

৮. Baral, Sayantika, & Tuhin Ghosh, "Historical Influx of East Pakistan Refugees and Their Resettlement in West Bengal (India): *Contemporary Social Physics, Springer Geography*, February 2025, pp. 31-52.

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, *দেশভাগ- দেশত্যাগ*, প্রকাশক, অনিল আচার্য, অনুস্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ ৬৯।

১০. তদেব, পৃঃ ৩৪।

১১. Das, Priyanka, "Where Death Looked Down: Refugees at Post- Partition Sealdah Station, Kolkata: *Kolkata Partition Museum*, 2017 (Intern, 'Chronicling Resettlement' Project), p. 39-40. https://kolkatapartitionmuseum.org.

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, *দেশভাগ- দেশত্যাগ*, প্রকাশক, অনিল আচার্য, অনুস্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ ৭১।

১৩. Chatterji, Joya, *Spoils of Partition: Bengal and India, 1947-1967*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 123-128.

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, *দেশভাগ- দেশত্যাগ*, প্রকাশক, অনিল আচার্য, অনুস্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ ৭২।

১৫. তদেব, পৃঃ ৭১-৭২।

১৬. তদেব, পৃঃ ৭২-৭৩।

১৭. চক্রবর্তী, ত্রিদেব, নিরূপমা রায় মণ্ডল, পৌলমি ঘোষাল, *ধ্বংস ও নির্মাণঃ বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ*, স্কুল অব কালচারাল টেক্সটস অ্যান্ড রেকর্ড, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতাঃ সেরিবান প্রকাশনী, ২০০৭, পৃঃ ১০-১১।

১৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, *দেশভাগ- দেশত্যাগ*, প্রকাশক, অনিল আচার্য, অনুস্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ ৭৪-৭৫।

১৯. তদেব, পৃঃ ৭৫।

২০. তদেব, পৃঃ ৭৬।

২১. *Hindustan Standard*, 22th November 1949, West Bengal State Archive, Calcutta, p.88-119.

২২. *Basumati*, 4th February, 1950, West Bengal State Archive, Home Political C.R. B, May 1950, p. 220-222.

২৩. Home Political C.R. B, March 1950, West Bengal State Archive, p. 242-228.

২৪. চক্রবর্তী, ত্রিদেব, নিরূপমা রায় মণ্ডল, পৌলমি ঘোষাল, *ধ্বংস ও নির্মাণঃ বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ*, স্কুল অব কালচারাল টেক্সটস অ্যান্ড রেকর্ড, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতাঃ সেরিবান প্রকাশনী, ২০০৭, পৃঃ ১২।

২৫. Home Political C.R.B March 1950 B p-242-148.

২৬. Home C.R. File No. 155/50 May 1950, B Proceedings, West Bengal State Archive, p. 279-327.

২৭. Home Political C.R. 1950, p. 224-225.

২৮. *যুগান্তর* পত্রিকা, ৪ই মে, ১৯৫০।

২৯. Number of Evacuees: A Government Report, Home Political C.R. 'B' Proceedings, April 1950, Commonwealth Relation Section, New Delhi, Express Letter by Air Mail, West Bengal State Archive, p. 330-336.

৩০. DIG, IB Report, West Bengal State Archive, Calcutta.

৩১. রায়, রাহুল, *পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গেঃ দেশবদলের স্মৃতি*, কলকাতাঃ গাঙচিল প্রকাশনী, ২০১৫, পৃঃ ১৫-১৬।

৩২. Chatterji, Joya, *Spoils of Partition: Bengal and India, 1947-1967*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 130.

৩৩. চক্রবর্তী, ত্রিদেব, নিরূপমা রায় মণ্ডল, পৌলমি ঘোষাল, *ধ্বংস ও নির্মাণঃ বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ*, স্কুল অব কালচারাল টেক্সটস অ্যান্ড রেকর্ড, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতাঃ সেরিবান প্রকাশনী, ২০০৭, পৃঃ ১৩।

৩৪. মিনিস্টারি অফ হোম আফেয়ার্স, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, বার্ষিক রিপোর্ট, (১৯৫৮), পৃঃ ৩৯।

৩৫. রায়, রাহুল, *পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গেঃ দেশবদলের স্মৃতি*, কলকাতাঃ গাঙচিল প্রকাশনী, ২০১৫, পৃঃ ১৫-১৬।

৩৬. নাকাতানি, টেটসুয়া, "অ্যাওয়ে ফ্রম হোমঃ দি মুভমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট অফ রিফিউজিস ফ্রম ইস্ট পাকিস্তান ইনটু ওয়েস্ট বেঙ্গল", ইন্ডিয়া, *জার্নাল অফ দ্য জাপানিজ অ্যাসোসিয়েশন ফর সাউথ এসিয়ান স্টাডিজ*, ১২ (২০০০), পৃঃ ৮৮।

৩৭. তদেব, পৃঃ ৮৯।

৩৮. চক্রবর্তী, ত্রিদেব, নিরূপমা রায় মণ্ডল, পৌলমি ঘোষাল, *ধ্বংস ও নির্মাণঃ বঙ্গীয় উদ্বাস্তু সমাজের স্বকথিত বিবরণ*, স্কুল অব কালচারাল টেক্সটস অ্যান্ড রেকর্ড, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতাঃ সেরিবান প্রকাশনী, ২০০৭, পৃঃ ১৪।

৩৯. তদেব, পৃঃ ১৬।

৪০. Biswas, Sukumar, *Communal Riots in Bangladesh & West Bengal 1947-1964*, Kolkata: Parul Publishers, 2012, p. 92-93.

৪১. গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ১৯৭৬, অ্যাপেন্ডিক্স- ১১১, (টেটসুয়া নাকাতানি,১৯৭৮)

৪২. রায়, রাহুল, *পশ্চিম থেকে পূর্ববঙ্গেঃ দেশবদলের স্মৃতি*, কলকাতাঃ গাঙচিল প্রকাশনী, ২০১৫, পৃঃ ১৭।

৪৩. তদেব, পৃঃ ১৮।

৪৪. Sengupta, Anwesha, "Bengal Partition Refugees at Sealdah Railway Station, 1950-1960", *Institute of Development Studies Kolkata*: November 17, 2021, Volume 42, Issue 1, pp.1-32. https://doi.org/10.1177/0262728021105480.

৪৫. Sanyal, Romola, "Hindu Space: Urban dislocation in post -partition Calcutta", *Transactions of the Institute of British Geographers*, 2014, Vol. 39, No.1, pp. 38-49. https://www.jstor.org/stable/24582857.

৪৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ, *দেশভাগ- দেশত্যাগ*, প্রকাশক, অনিল আচার্য, অনুস্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ ৭৭-৭৯।

৪৭. চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, *প্রান্তিক মানবঃ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনের কথা*, কলকাতাঃ নয়া উদ্যোগ প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃঃ ১২৬-১৩০।

৪৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়, *উদ্বাস্তু*, কলকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ১৯৭০, পৃঃ ১২৪-১৩০।

৪৯. Chakrabarti, Dipesh, "Remembered Villages: Representation of Hindu- Bengali Memories in the Aftermath of the Partition", *Economic and Political Weekly*, August 10, 1996, Vol. 31, No.32 (August 10, 1996), pp. 2143- 2145+2147-2151. https://www.jstor.org/stable/4404497.

৫০. Ray, Manas, "Growing up Refugee", *History of Workshop Journal*, Spring, 2002, No.53 (Spring, 2002), pp. 149-179, Oxford University Press. https://www.jstor.org/stable/4404497.

৫১. Chatterji, Joya, "Disposition and Destinations: Refugee Agency and 'Mobility Capital' in the Bengal Diaspora 1947-2007", *Comparative Studies in Society and History*, April 2013, Vol. 55, No.2 (April 2013), pp. 273-304. https://www.jstor.org/stable /23526382.

৫২. চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার, *প্রান্তিক মানবঃ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনের কথা*, কলকাতাঃ নয়া উদ্যোগ প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃঃ ১৩৬।

৫৩. Sanyal, Romola, "Contesting refugeehood: Squatting as survival in Post- Partition Calcutta", Rice University, *Chao Centre for Asian Studies*, USA, Social Identities, Vol. 15, No.1, January 2009, pp. 67-84. https://dx.doi.org/10.1080/13504630802692937.

৫৪. Samaddar, Ranabir, *The Marginal Nation: Transborder Migration from Bangladesh to West Bengal*, Sage Publication, New Delhi: 1999, p. 210.

৫৫. Khan, Tahir & Kiran, Naumana, "Rehabilitation and Settlement of Refugees in East Bengal: Role of Federal Government of Pakistan, 1947-1950," *Journal of the Punjab University Historical Society*, Vol. 33, No. 1, June 2020, pp. 103-116.

৫৬. Sengupta, Anwesha, "The Refugee Colonies of Kolkata: History, Politics, and Memory," *Institute of Development Studies,* Kolkata, 2007, pp. 1-10.

doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.18427450

৫৭. Resettlement & Rehabilitation- Minorities and Refugees: Question of Employment, East Bengal Government Policy regarding exodus and refugee situation, File No. 503/50, Home Political C.R.B-April 1950, p. 283-286. https://sadte.wb.gov.in.

৫৮. Chatterji, Joya, *Spoils of Partition: Bengal and India, 1947-1967*, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 139.

৫৯. Ibid, p. 140.

৬০. Chatterjee, Nilanjana "Interrogating Victimhood: East Bengali Refugee Narratives of Communal Violence" London: *Swadhinata Trust*, Retrieved on June 12, 2010 from: http://www.swadhinata.org.uk/document/chatterjeeEastBengal%20Refugee.pdf.